নারীর হাতে বেত

ড. শিবশঙ্কর পাল

নারীর হাতে বেত! এই বেত কিন্তু ছড়ি নয়। বরং এই বেত, বেত শিল্পের বেত। বেতের চেয়ার, টেবিল, সোফা, দোলনা আমরা সবাই দেখি। যা তৈরী হয় আলিপুরদুয়ার বা জলপাইগুড়ির পুরুষ শিল্পীর হাতে। অন্যদিকে এই বেতকে অনন্য শিল্পে পরিণত করছে কিছু কিছু মহিলা শিল্পী। নরম হাতের কোমল গঠন শিল্পে সেসব বেত হয়ে ওঠে— ফলের ঝুড়ি, ফুল তোলা সাজি, টেবিল ল্যাম্প, সিলিং ল্যাম্প, স্ট্যান্ড ল্যাম্প, ফল রাখা ট্রে, গ্লোব। এসব কাজে বেতের সঙ্গে লাগে শীতলপাটি বা ফালি। বুকারি গোল বেতি। আর ফুটো করার জন্য ভোঁড়। তবে সবটাই করা হয় হাতে। এই বিশেষ বেত শিল্পের সঙ্গে খুব বেশি সংখ্যাক মহিলা যুক্ত নেই। আর যারা যুক্ত আছে তারা এসব শৌখিন ও ব্যবহার উপযোগী জিনিসপত্র বানায় না। তারা চেয়ার টেবিল দোলনা তৈরী করতে যে বেত লাগে তা চাঁছার কাজটি করে। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের B.Tech. কলেজের পাশে ডাঙ্গাপাড়া নামক জায়গার আয়না দাস (বর্তমানে বয়স্ক), শিবাণী কর্মকার, সাবিত্রী দাস, কৃষ্ণা দাস নামক মহিলারা বেত দিয়ে ছোট ছোট সামগ্রী বানায়। ওদের পুরুষরা বেত নিয়ে আসে শিলিগুড়ি থেকে (১০০ পিস বেতের দাম ১১০০/- থেকে ১২৫০/- টাকা)। শীতলপাটি আনে কোচবিহার থেকে। ৩৫০/- টাকা কেজি হিসাবে। মালয়েশিয়া থেকে শিলিগুড়িতে রপ্তানি হওয়া বুকারি গোল বেতি কিনে আনে ওরা। ৮৫০/- টাকা কেজি দরে। মোটামুটি ৪টি বড় আকৃতির ফলের ঝুড়ি বানাতে এক বাণ্ডিল বা ১০০টি বেত লেগে যায়। যে ঝুড়ির একটির দাম হয়

৫০০ টাকার মতো। ৪ টি ঝুড়ি বানিয়ে আয় ৭৫০ থেকে ৯০০ টাকা। সঙ্গে লাগে পরিশ্রম। কারিগরি দক্ষতা। বুনন পারদর্শিতা। প্রথমে মহিলারা বেত চাঁছার কাজটি করে। পুরুষরা ওই বেত দিয়ে ঝুড়ি ল্যাম্পের মূল স্ট্রাকচারটা তৈরী করে। বাকি কাজটা সবটাই মহিলাদের। মহিলারা ওই মূল কাঠামোর উপর বুকারি গোল বেতি দিয়ে অলঙ্করণের কাজটি করে। গোল, প্যাঁচানো, জালিকাকার, দৃষ্টিনন্দিত অলঙ্করণ চলে তারপর। তাতে, বেতিগুলো নানারকম রূপ ধারণ করে। গোলাকার,,বর্গাকার, ডিম্বাকার, ষড়ভুজাকার আকৃতির জিনিসপত্র তৈরী করে ওসব মহিলারা। এভাবেই সাজি/ঝুড়ি/গ্লোবের সৌন্দর্য বাড়ে। সময়ও লাগে এই কাজে। অলঙ্করণ হয়ে গেলে ভোঁড় দিয়ে ওই ঝুড়ি বা সাজির মাঝে মাঝে ফুটো করে মহিলারা। ওই ফুটোর ভিতর দিয়ে শীতলপাটি বা ফালি ঢুকিয়ে ঝুড়ি বা সাজিকে টাইট করে বাঁধা হয়। তাতে অলঙ্করণে লাগে বুনন মাধুর্য। (কাজের সুবিধার জন্য বেতি ও শীতলপাটি জলে ভিজিয়ে নেয় ওরা। তাতে আকার ও বাঁধন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছায়। কাজেও সুবিধা হয়।) তারপর আগুনে ঝলসালে বেতের রোঁয়াগুলো পুড় যায়। তাতে ঝুড়ি হয় মসৃণ চকচকে। আগুনের তাপ আনে বাদামী আভা। যা পরে স্থানীয় বা দেশের মেলাখেলায় বিক্রি করে শিবাণী কর্মকারের মতো বেত শিল্পীরা। কলকাতা বা আমেরিকাতে এসব সামগ্রী Online-এর মাধ্যমেও রপ্তানি করে ওরা। বয়স্ক আয়না দাস এই বেত শিল্পের জন্য পুরস্কার পেয়েছে আগেই। তার ঘরের মেয়েরা এই কাজকে আজও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে শিবানী কর্মকার বা কৃষ্ণা দাসের মতো মহিলারা এই কাজ করে মনের আনন্দে। আয়ের উৎস হিসাবেও।

হাতে গোনা এসব বেত শিল্পীদের এই শিল্প প্রচেষ্টাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার। মহিলারা যে সব ধরণের কাজ পারে, এটা তারই উদাহরণ। বুকারি গোল বেতির উপর শীতলপাটির বাঁধন দিতে দিতে শিবানী কর্মকার জানিয়েছিল, এসব কাজ করতে গিয়ে হাত ছিঁড়ে যায়। ব্যথা করে। কিছুক্ষণ আগে এক ঘন্টা বিশ্রাম নিচ্ছিল সে। ওই ব্যথার কারনে। তাছাড়া এসব কাজ, ঘরের ভিতরে ছায়ায় বসে করা যায়। বাইরে যেতে হয় না। বছরের কয়েকটি মেলা (কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান) ছাড়া বিশেষ বিশেষ সংস্থা বা ব্যক্তিগতভাবে অনলাইনে এসব জিনিস পাঠাই ওরা। গত মাসে (এপ্রিল ২০২৪) ওরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মাল রপ্তানি করেছে। আবার ওই মাসেই ৫০০ পিস ফলের ঝুড়ি পাঠিয়েছে আমেরিকা। বর্তমানে আমেরিকার জন্য অর্ডারের মাল বুনছে সে। সেখানে পাঠাতে হবে সবরকম ছোট-বড় শৌখিন জিনিসপত্র। সংখ্যায় ৫০০টি আইটেম। সেলাই করতে করতে, ভোঁড় চালাতে চালাতে এসব কথা বলে যাচ্ছিল অখ্যাত এই মহিলা বেত শিল্পী। পাশেই পরে রয়েছে অর্ধসমাপ্ত ফলের ঝুড়ি, সিলিং ল্যাম্প, ফল রাখা ট্রে, সাজি। এই মহিলা শিল্পীর কথা— আমিই চাঁছি, গোল বেতি বুনি, সেলাই করি, আগুনে ঝলসায়। ইচ্ছে হলে কাজ করি, না হলে বিশ্রাম। গৃহকাজের মাঝে-ফাঁকে সময় পেলে হাত দিই বেতে। সকাল দশটা থেকে রাত নটা অবধি চলে হাত। আর বলে— ‘হাত-ফাত ফাইট্যা গেছে সেলাই করি।’

মহিলাদের এই কাজের খোঁজটি আজও আজানা অনেকের কাছে। সরকারের তরফে এসব শিল্পীরা না পেয়েছে সম্মান, না পুরস্কার। না বিশেষ কোনও সহায়তা। হস্তশিল্প মেলায় গেলেও স্বামীদের আড়ালে ওদের কেও খোঁজে না। সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখেও ওরা স্বল্প। কিন্তু বেত শিল্পের একটা বিশেষ দিককে ওরাই ধরে রাখছে। অলঙ্করণে আনছে পছন্দসই বৈচিত্র। ব্যবহারের নানা উপকরণ তৈরী করে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ কুটির শিল্পকে। আয়ও করছে মাসে হাজার পনেরো কুড়ি। এসব মহিলারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে, দেশ-বিদেশের নানা কর্মশালায় এদের নিয়ে গেলে শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হবে। তাতে সন্দেহ নেই। মহিলা স্বনির্ভরতার পথে ওরাও উদাহরণ তুলে ধরতে পারে। জেলা বা রাজ্য স্তরের হস্তশিল্পে আলাদা পালক যোগ করতে পারে। আসুক না এসব নাম না জানা (পুরুষ শিল্পীর ভিড়ে হারাতে বসা) মহিলা শিল্পীরা প্রচারের আলোকে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সৌকর্যের একটা নতুন দিক খুলে যাবে। নতুন নতুন মহিলারা আদর্শ খুঁজে পাবে। এই পথে হাঁটবে। ‘নারীর হাতে বেত’ হয়ে উঠবে শিল্পকলার আরেকটা নমুনা।